সমান্তরাল সিনেমার রাজনীতি

সোমা . এ. চ্যাটার্জী

অনুবাদ - পিনাকী নাগ

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সিনেমার অস্তিত্ব আছেকিনা, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আবশ্যিক ভাবেই আরো কিছু প্রশ্ন এসে যাবে। রাজনৈতিক সিনেমার সংজ্ঞা নির্ণয় করা যাবে কি ভাবে? একান্ত ভাবে রাজনীতি বিমুখ সিনেমার আদৌ সম্ভব কিনা?রাজনীতি যদি কোন বিশেষ বিষয় বা বক্তব্যের প্রচারক হয়ে ওঠে, তাহলে তো কোন শিল্পীর ব্যক্তিগত নান্দনিক সৃজনশীল চেতনাও কোন বিশেষ বক্তব্যর প্রবক্তা হয়ে উঠতে পারে। Jeanine Meerapfel জার্মানীতে কর্মরতা এক আর্জেন্তানীয় পরিচালিকা, যার ছবি তার নিজের দেশেই প্রায়শ নিষিদ্ধ , শুধু তীব্র রাজনৈতিক বক্তব্যের কারণে তিনি বলেছেন প্রতিটি ছবিই রাজনৈতিক ছবি কারণ, সে ছবি নির্মাতার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে।

চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি শিল্প মাধ্যম সেগুলির আবেদন সিনেমার তুলনায় কম, সেগুলিতে রাজনৈতিক মুখরতাও অপেক্ষাকৃত ভাবে কম, কারণ আমজনতার শ্রুতি ওদৃষ্টির কাছে সিনেমার তুলনায় তাদের ভেদশক্তি তুলনামুলক ভাবে অনেক দুর্বল। সে কারণেই রাজনৈতিক সিনেমার সংজ্ঞা নির্ণয়ের কাজটি কঠিন, কিন্তু জরিও বটে।

গোবিন্দ নিহালানি রাজনৈতিক সিনেমার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন ‘‘সেই সিনেমাই হ’ল রাজনৈতিক সিনেমা যা চিত্র নির্মাতার আর্দশগত দৃষ্টি ভঙ্গিকে তুলে ধরে, দর্শকদের কাছে তার বক্তব্যকে পৌঁছে দেয় এবং সর্বোপরি তাদের চেতনার পরিবর্তনঘটিয়ে দর্শককে চিত্রনির্মাতার নিজস্ব বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তোলে।’’

মৃণাল সেন বলেছেন, ‘‘ রাজনৈতিক সিনেমা বলতেলোকে কি বোঝে আমি ঠিক জানি না।আমি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নই। কিন্তু ছবি তৈরির প্রশ্নে আমি রাজনৈতিক ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাই।’’

প্রয়াত জি. অরবিন্দন, যিনি স্বীকার করছেন যে, তার ‘‘উত্তরায়ণম’’ ছবির মধ্যে রাজনৈতিক আবেগের ছোঁয়া আছে। তিনি বলেছেন ‘‘ আমার মনে হয় ভারতীয়প্রেক্ষাপটে একটি সৎ রাজনৈতিক ছবি তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কেউ হয়ত সে রকম ছবি করতে পারে, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত পর্দায় প্রতিফলিত হবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ ধরনের বিপর্যয় ঘটতেই পারে, কারণ কেউ যদি যথার্থ সততারসঙ্গে রাজনৈতিক ছবি করতে চায় তবে তাকে অনেক বিস্ফোরক কথা বলতে হবে। হাল্ক চালে এখান ওখানে সামান্য রাজনীতির ছোঁয়া লাগিয়ে রাজনৈতিক ছবি করার চেষ্টা একান্তই অর্থহীন। কেউ যদিপ্রকৃত সততার সঙ্গে রাজনৈতিক বাস্তবতার কথা ভাবে তবে তাকেতা সাহসিকতার সঙ্গে সোজাসুজি দেখাতে হবে। আমার কাছে একটি সৎ রাজনৈতিকছবি হচ্ছে অত্যন্ত জোরালো এক প্রচার পুস্তিকা অথবা স্লোগানের মত। আমার সীমিত অভিজ্ঞতাথেকেই বলছি, আমার মনে হয় পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি এ বিষয়েপ্রচুর স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে। লেখকের মন্তব্য পূর্বইউরোপে রাজনৈতিক

ধবংস নামার আগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। 'Costa Gavaras' এর 'Z' 'Missing' অথবা 'State of Seige' -এর মত ছবি তাদের দেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক। কিন্তুআমরা একমাত্র বেকারীত্বের যন্ত্রনা ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা আমাদের ছবিতে আনতে পারছি না। গোবিন্দ নিহালানির ''আঘাত'' ছবিটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। মার্কস বাদেরতত্ত্ব এবং বিশ্লেষণের নিরিখে সেটি এক অত্যন্তগু ত্বপূর্ণছবি''।

লক্ষ্য করার বিষয় উপরোক্ত চিত্র নির্মাতারাকেউ কিন্তু প্রকৃত এবং সুনির্দিষ্ট ভাষায় রাজনৈতিক সিনেমার সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি। এর একমাত্রকারণ ছকে বাঁধা গতানুগতিক কোন সংজ্ঞার দ্বারা রাজনৈতিক সিনেমাকে বাঁধাসম্ভব নয়।

কেরালার কে.জি. জর্জ. যিনি কিছু রাজনৈতিক ছোঁয়ালাগা ছবি করেছেন, তার বক্তব্য হলো ''প্রায় সব ভালো ছবিতেই কিছু না কিছু রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা আছে। ভারতবর্ষের মাটিতে নিরেট বাণিজ্যিক ছবি তৈরি করা রীতিমত কঠিন কাজ।'' তাছাড়া এধরনের ছবি প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্ন আছে। স্বদেশে তোবটেই, এমন কি বিদেশেও যদি এ ধরনের ছবি তৈরি হয়, তবেকারা তার দর্শক সে বিষয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে শাসক শ্রেণীর দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপব্যবহারকে যেসিনেমা প্রফট করে তোলে, তাই হলো ভালো রাজনৈতিক সিনেমা। তিনি বলেছেন রাজনৈতিক সিনেমার পশ্নে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রকৃত ভালো সিনেমা কখনই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না।

রাজনৈতিক সিনেমা হলেই যে,''তামস'', '' আক্রোশে'', অথবা ''অর্ধসত্য''-র মত খোলামেলা হতে হবে , এমন কোন কথা নেই।সত্যজিৎ রায়ের ''প্রতিদ্বন্দ্বী'',''সীমাবদ্ধ'', ''জনঅরণ্য' এমনকি''গণশত্রু'' ও বেকারত্ব, সম্পিস্নদ্বলিত শ্রমিক শোষণ এবংছোট ব্যবসায় ও ছোট শহরের দুর্নীতি বিদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক বক্তব্যবাহী ছবি। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সেগুলির কোনটাই খোলামেলা রাজনৈতিক ছবি নয়, যদিওতাদের মধ্যে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বক্তব্যের আভাস পাওয়া যায়।

হতে পারে একজন চিত্র নির্মাতার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তার অবচেতন মনের প্রভাবেই তার কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সেদৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, যাই হোক না কেন। এইভাবনা থেকেই কেতন মেহতা বলেছেন, '' প্রতিটি ছবিই আসলে রাজনৈতিক ছবি। কিন্তু লোকে তাকে রাজনৈতিক সিনেমা হলে না কারণ, সে সবছবির উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নয়। সে সব ছবির লক্ষ্য হলো দর্শকদের বিনোদন যা মূলস্রোতের ছবির ধর্ম। অথবা সে সব ছবি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচারকও হতে পারে। যখন একজন চিত্রনির্মাতা অত্যন্ত সচেতন ভাবে তার ছবিকে সামাজিক ওরাজনৈতিক ভাবে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চান এবং যখন সাহিত্য, চিত্রগ্রহণএবং অন্যান্য অনুষঙ্গের সহায়তা ছাড়াই তারবার্তা দর্শকদের কাছে পৌঁছেদিতে পারেন, একমাত্র তখনই তা এক রাজনৈতিক ছবি হয়ে উঠতে পারে।''

বাংলার বাইরে রাজনৈতিক সিনেমা

১৯৮৬ সালে রমেশ শর্মার প্রথম কাহিনী চিত্র'কার্লোভি ভ্যারি' চলচ্চিত্র উৎসবে তুফান তুলিছিল। 'নিউদিল্লী টাইমস' রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক দুর্ধর্ষ আক্রমক পত্রিকা। চলচ্চিত্র উৎসবে সাক্ষৎকার গ্রহণের সময় উক্ত পরিচালক বলেছেন ''আমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। আমার ধারণা আরো অনেকদিন ধরে ফ্যাসিবাদী শক্তি সেখানে চালকের আসনে থাকবে এবং গণতন্ত্র সেখানে শুধু দর্শনধারী মাত্র থেকে যাবে। পত্রিকা হলো সমাজের দর্পণ, আর সেই সংবাদপত্র বড় বড় শিল্প গোষ্ঠীর দখলে। তারা তাদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট। এখনকার মিশ্র সমাজ এবং সেই সমাজবদ্ধ মানুষের পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠী অথবা একত্রে কর্মরত গোষ্ঠীর দিকে তাকালেই বড় ছবি করার অজস্র উপাদান পাওয়া যাবে। দশ বছর বাদে সেইরমেশ শর্মাই ডি. ডি. মেট্রোর জন্য সংবাদ তৈরি এবং প্রচার করছেন।আর সেসব সংবাদ অধিকৃত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হচ্ছে সেই গণতন্ত্রের দ্বারা, যা কিনা তার ভাষ্য অনুযায়ীই ফ্যাসিবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।''নিউ দিল্লী টাইমস'' একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কাজ শু করেছিল বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিষয়টি একটি রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছিল। এর এক পর্যায়ে ছিল বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ, অন্য পর্যায়ে এরকাহিনী চরিত্র এবং কাহিনীর উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ধরা ছোঁয়া যায়নি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এ সব সমালোচনায় তিনি নিজের জায়গাথেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি, যা তার সুনামকে ব্যাহত করতে পারত। তিনি এমন একটি পথ অবলম্বন করলেন যাতে তার ব্যক্তিগত আবেগকে নিয়ন্ত্রিত না করেইএই বিষয় গুলিকে তুলে ধরা যায়।

আদুর গোপাল কৃষ্ণনের ''মুখামুখম''-এর প্রধান চরিত্র এক শ্রমিক, যারমধ্যে আগুন আছে এবং যে অন্যকে উদ্দীপিত করতে পারে। সে একদিন হঠাৎ নিদ্দেশ হয়ে গেল। দশবছর বাদে যখন তার প্রত্যাবর্তন ঘটল, সে তখন সম্পূর্ণ মদ্যপ। তারসম্পর্কে তার সতীর্থদের হতাশা, বিড়ম্বনা এবং ত্রোধ এক সময় সেই মদ্যপ চরিত্রের মৃত্যু ঘটলো। কিন্তু তার মৃত্যুর পর জনচিত্তে তার পুনরাবির্ভাব ঘটল বীর নায়ক হিসেবে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত কেরালার রাজনৈতিক পটভূমির প্রেক্ষাপটে এই ছবিকে দর্শকেরা ভুল বুঝেছে। তাদের কাছে মনে হয়েছে এ বুঝি কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা। কিন্তু আসলে এই ছবির মূল উপজীব্য ছিল উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে জনমানসে ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হতাশা। এইচিত্রে শুধু অতীতেরই নয়, বিষয়টি বর্তমানেও প্রসঙ্গিক। ছবিটির তিনটি পর্যায়ে - প্রথম পর্যায়ে আছে অতীতের স্মৃতি, দ্বিতীয় পর্যায়ে কল্পনা এবং তারপর এই দুই স্তর পেরিয়ে বাস্তবের উপলব্ধি, যা ছবিটির সিংহভাগ জুড়ে আছে।

গোপালকৃষ্ণ নিজে দাবি করেন যে, তার এই ছবির বিষয়, রাজনীতি। তার কথায় একদল স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী নিজেদেরকে প্রগতিশীলতা রক্ষার দাবিদার বলে মনে করে এবং তারাই ছবিটির বিদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। এর ফলে ছবিটির সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই এমন বহু মানুষ বিরুদ্ধে প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ছবিটির মধ্যে রয়েছে সাধারণ মানুষের ভীতি আশঙ্কা এবং সংশয় উৎপাদন কারী ঘটনাবলীর সম্পর্কে গভীর উৎকণ্ঠা পর্যবেক্ষণ। এর প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সমকালীন সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস, এবং অবশ্যই কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি তোষণ সর্বতো ভাবে বর্জিত হয়েছে।

যাই হোক গোপালকৃষ্ণ স্বয়ং কিন্তু দাবি করেন যে''মুখামুখম'' কোন রাজনৈতিক ছবি নয়। তার ব্যাখ্যা হলো তার এই ছবি যতটা রাজনৈতিক তার থেকে অনেক বেশি মানবিক। তার বক্তব্য, আমি কোন রাজনৈতিক সিনেমা নির্মাতার ভান করতে চাই না। রাজনৈতিক ছবি করতে গেলে রুখে দাঁড়াতে হয়, যুদ্ধ করতে হয়, দায়বদ্ধ হতে হয়। একজন বিবেকশীল চিত্রনির্মাতা হিসাবে আমি কখনই বলি না যে, রাজনৈতিক বিষয় আমাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু তাই বলে রাজনীতি আমাকে গিলে ফেলুক এটাও আমি চাই না।

কেতন মেহতার তৃতীয় এবং বহু প্রশংসিত ছবি''মির্চ মশালা'' পর্দায় আসার পর তার সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় তিনি বলেছেন, ''আমি আশাবাদী। আমি মনে করি চলচ্চিত্রে প্রতিরোধ এক অত্যন্ত জরুরি বিষয়। অত্যাচারকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা একান্তই অমানবিক। এতে অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত, উভয়েই মানবতার অবমাননা ঘটায়। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই আমাদের শেষ আশা। এটা করতে গেলে যা প্রয়োজন তা হলোযে অবস্থায় মধ্যে আমরা আছি, তার সম্পর্কে, গভীর বাস্তব উপলব্ধি বোধ। ঔপনিবেশিকতা বিদায় নিলেও স্বৈরাচার আজও আমাদের ছেড়ে যায়নি। কিন্তু নৈরাশ্য বাদীর মত আমি এ কথাও বলব না যে, কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। অত্যাচারিতরা ইতোমধ্যে অনেক অধিকারই অর্জন করেছে। চিপকো এবং ঐধরনের অনেক আন্দোলনের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরিবর্তন কখনইচাপিয়ে দেওয়া যায় না, তাকে উঠে আসতে হবে তৃণমূল থেকে।

গুজরাতি লেখক চুনিলাল মাদিয়ার গল্পের ভিত্তিতে রচিত 'মির্চ মশালা' কেতন মেহতার কিছু গভীরতম ভাবনাকে তুলে ধরেছে। স্বাধীনতা কাকে বলে? স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে আমরা কি সত্যিই স্বাধীন? নিরাপত্তার প্রশ্নটি কি স্বাধীনতার থেকেও বেশি গুরুত্বপূণ? সমষ্টি স্বাধীনতা অথবা সমষ্টি নিরাপত্তার তুলনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গুরুত্ব কি কম? নানা সংকেতের মধ্য দিয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে, যা প্রায়শই গতানুগতিক। কিন্তু কেতন মেহতা সে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গতানুগতিকতার বেড়া ভেঙেছেন প্রশংসনীয় কুশলতায়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ছবিটিতে লাল মরিচের ব্যবহারের কথা। লাল মরিচ এই ছবিতে নানা বিপরীত মুখীনতার দ্যোতক। গুঁড়ো মশলার কারখানায় টকটকে লাল মরিচপেষাই করে গ্রামের মহিলারা। এখানে আমরা দেখতে পাই হিংসা শ্রয়িতা, বিদ্রোহ এবং যৌনতার ইঙ্গিত। কিন্তু এ ছাড়াও লাল রং-এর মধ্যে আরো কিছু ব্যঞ্জনা খুঁজে পাওয়া গেছে এই ছবিতে। গ্রাম্য মেয়েদের ব্যবহৃত দোপাট্টার রং লাল। গ্রামসুবেদার তার দলবলের সঙ্গে লড়াইএ ফুটি-ফাটা শুকনো মাটির বুকে ছল্‌কেপড়া গ্রামের মানুষের রক্তের রঙও একই রকম লাল। এই ছবিতে লাল রং পরস্পর বিরোধী ভাবনাকে উদ্দীপিত করেছে বারংবার। কখনও এই লাল রং অত্যাচারের প্রতীক, কখনও বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের। লাল রং এই ছবিতে কখনও জীবনের আশ্বাস কখনও বা মৃত্যুর আংশকা।

প্রতিরোধের বার্তাবাহীছবির প্রতি কেতন মেহতার দুর্বলতা অনেক দিনের, কিন্তু সেই ভাবনা একসার্থক মাত্রা পেয়েছে১৯৮৪ সালে তার প্রথম ছবি''হোলি''র মধ্যে। ছবির নামটাই ইঙ্গিতপূর্ণ এবং গল্পবলার ভঙ্গিটিও বিদ্রূপাত্মক। প্রচলিত অর্থে হোলি হলো বসন্ত কালেরং-এর উৎসব। কিন্তু এই আনন্দানুষ্ঠান উপলক্ষে প্রজ্জ্বলিত আগুন শেষ পর্যন্ত একদল ছাত্রের বিদ্রোহের আগুন হয়ে উঠল। তাদের বিদ্রোহ

আমানবিক অ-ফলপ্রসু প্রতিষ্ঠানিকতা দুষ্টশিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ছবির মধ্যে কিছু উদ্ভট ঘটনা এবং চমক লাগানো ক্যামেরার কাজ ছাড়াও এমন এক প্রেরণা এবং গতি আছে যা ভারতীয় চলচ্চিত্রে একান্ত দূলর্ভ। অসন্তোষের আগুনে জ্বলা ছাত্রদের ক্ষোভ, যা তীব্র রূপকের ব্যবহারে আমাদের সমকালীন সমাজকে চিনিয়ে দেয়- সমস্ত বিষয়টার মধ্যেই এক বিষন্নবেদনার রং। সমাজের বুকে তরুণ প্রজন্মের কি নিষ্ঠুর অপচয়। এ সব কথা বলতে গিয়ে ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে 'কাঁহা যা রহে হ্যায়'- এর মত গান, যার মধ্যে খুঁজেপাই ব্রেখটিয় পদ্ধতির প্রতিধ্বনি।

সুধীর মিশ্রের প্রথমকাহিনী চিত্র 'ইয়ে ও মঞ্জিল নেহি'তে আমরা দেখি কেতন মেহতার ছবিদুটির অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর সংমিশ্রণ। এই ছবিতেও ভেসে উঠেছে দেশের চিন্তাশীল মানুষের অমোঘ প্রশ্ন, এই কি সেই ঈপ্সিত স্বাধীনতা, যার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি? এখানেই কি আমরা পৌঁছোতে চেয়েছিলাম? এই ছবির দুই চরিত্র, দুই প্রজন্মের মানুষ, কিন্তু সমকালীন সময়ে একই চিন্তায় একই লক্ষ্যে চলেছে- তাদের মধ্য দিয়েই উপরোক্ত প্রশ্ন গুলির উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কাহিনীবর্ণনা, কাঠামো, চিত্রগহণ, সব কিছুর মধ্যেই মুন্সিয়ানার ছাপ আছে। ছবির নামইবলে দেয় ছবিতে উঠে আসা প্রশ্নগুলি র উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্যযাত্রা শুরু হয়েছে। তিন বয়স্ক মানুষকে নিয়ে গল্প, যাঁরা দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাদে নিজেদের শহরে ফিরে এসেছেন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে যোগ দেবার জন্য। গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে এই তিনজন মানুষের তিন পৃথক সংঘাত। প্রথম সংঘাত তাদের স্মৃতি ও স্বপ্নের সঙ্গে যা ক্রমাগত তাদের মনে ভীড় করে আসছে। অতীতে তাদের সামনে ছিল অজস্র প্রতিশ্রুতি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় সংঘাত হলো বর্তমানে উক্তবিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত তাদের সতীর্থদেরসঙ্গে। সমস্যা এক হলেও দুই প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিস্তরপার্থক্য। তৃতীয় সংঘাত তাদের নিজেদের বিবেকের সঙ্গে। এই সংঘাত নাটকীয়ভাবে এসেছে ছবির শেষ পর্যায়ে।

কিন্তু তারপর কেতন মেহতা অথবা সুধীর মিশ্র কেউই আর কোন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক বার্তাবাহী ছবি করেনি। একজন সৃজনশীল শিল্পী হিসাবে বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা তাদের অবশ্যই আছে। তাছাড়া বাণিজ্যিক সাফল্যের প্রশ্নেও তাদের অধিকতর সহজ এবং সুবিধাজনক ছবি তৈরির কথা ভাবাতে পারে। তবে পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি অন্তত কেতন মেহতা বাণিজ্যিক ছবি তৈরির ক্ষেত্রে খুব স্বচ্ছন্দ নন। তাঁর তৈরি 'হিরো হীরালাল' এবং 'ও ডালিং ইয়েহ্যায় ইন্ডিয়া' উভয় ছবিই বাণিজ্যিক ভাবে অসফল। শ্রী মিশ্র আর একটি অর্থপূর্ণ ছবি করেছেন, এবং তারপরেই তার স্থানান্তর ঘটেছে ছোটপর্দায় তাঁর তৈরি একমাত্র বাণিজ্যিক ছবি 'খামোস' আকর্ষণীয় রহস্যকাহিনী, কিন্তু তাও বক্স অফিস দখল করতে পারেনি।

এ দেশে একমাত্র পরিচালক যিনিচূড়ান্ত আনুগত্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সিনেমাকে আঁকড়ে ধরে আছেন, তিনিহলেন গোবিন্দ নিহালানি। কাহিনীর দিক থেকে তার প্রায় প্রতিটি ছবিই তুলে ধরেছে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের সংগ্রামের কথা এবংসেই সঙ্গে বিকৃতএবং পরিবর্তনহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা। এমনকি তার ছবির নেতিবাচক চরিত্ররা, যেমন তার সর্বশেষ ছবি ''দ্রোহকাল'' -এর ভদ্র, তাদেরকেও দেখানো হয়েছে এই সমাজ ব্যবস্থার শিকার হিসাবে। নিজের ত্রুটিতেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, এদের অবস্থা শেষ পর্যন্ত ফাঁদেপড়া জন্তুর মত, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার আর কোন পথ

নেই।'অর্ধসত্য' ছবির ইনস্‌পেক্টর 'আক্রোশ' ছবির উকিল,'দ্রোহকাল'-এর উগ্রপন্থী দমন বাহিনীর দুই অফিসার- এরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মুখোমুখি, যার সামনে তাদের জীবনটাই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন। নিহালিনী স্বয়ং এই অবস্থার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন এই সব অবস্থাই তাদের আর্দশের বিরুদ্ধে আপস করতে বাধ্য করে। কিন্তু তার মধ্যেই সীমিত সুযোগের মধ্যেও তারা লড়াই করে আমাদের্য তাই করা উচিত।

নিহালানির নিজের কথায়''আমার আরো অনেক ছবির মতই ''দ্রোহকাল''-এর অনুপ্রেরণা এসেছে দেশের সমকালীন সময়ের অবস্থা থেকে।সাম্প্রতিক সময়ে কিছু সংগঠিত সংগঠনের হাত ধরে নানা হিংসাশ্রয়ী শক্তির উদ্ভব ঘটেছে, যা কিছু আন্তর্জাতিক শক্তির দ্বারা সমর্থিত। মানুষের বেদনা ও যন্ত্রণাই দ্রোহকাল ছবির কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু, এবং সে কাহিনী কখনই অতিনাটকীয়তায় ভেসে যায়নি। ছবিতে সমাধানের পথ হিসাবে শুধু'অ্যাকশন'কেই বেছে নেওয়া হয়নি। সেখানে ছবির প্রধান চরিত্রদের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাধানের সূত্র পাওয়ার চেষ্টাহয়েছে। এটাই হলো চূড়ান্ত মূহূর্তে ছবির চরিত্রের বেছে নেওয়া নিজস্ব পথ, যা তার ভবিষ্যৎ জীবনকে নির্ধারণ করবে এবং তার এই ভূমিকাই স্থির করবে ভবিষ্যৎ সমাজে তারকি অবস্থান হবে। নিহালানি সেভাবেই ছবির বিষয়কে দেখেছেন।

'দ্রোহকাল' ছবিটিতেএমন এক নিষ্ঠুর বর্বরতা পর্দায় বাঁধা পড়েছে, যা আতঙ্কবাদ, আতঙ্কবাদী এবং আতঙ্কবাদের শিকারদের সম্পর্কে এক ভয় ধরিয়েদেয়। অভয় এবং আববাস লোদী এক গোপনে পুলিশী অভিযানের সদস্য, যাদের কাজহচ্ছে আতঙ্কবাদীদের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের নির্মূল করা। আতঙ্কবাদীদের নেতা ভদ্র এক বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ, তীক্ষ্ণ যুক্তিসম্পন্ন, কিন্তুসে এক ভ্রান্ত ধারণা বহন করে চলেছে যে, আদর্শের কারণে হত্যা করাকোন অন্যায় কাজ নয়। সে ধারণা হয়ত ভ্রান্ত, কিন্তু সে নিজের বিশ্বাসে অনড়। এই দুই অফিসার কি ভাবে ভদ্রকে ফাঁদে ফেলল, তাই নিয়েই কাহিনীর বিস্তার। ছবির মধ্যে প্রকাশিত সত্য ছবির গল্পকেও ছাড়িয়ে গেছে, কারণ সেখানে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাটাই নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে- দুর্নীতি, ব্ল্যাকমেইল, মৃত্যু ভয়, মানুষ যে সব অন্যায়ের শিকারহতে পারে।

'তামস' পর্যন্তনিহালানির ছবিতে মূল সুর ছিল। বেঁচে থাকা অথবা টিকে থাকার সংগ্রামে,যেখানে লড়াকু চরিত্ররা তাদের অধিকার ফিরে পেতে অথবা কেড়ে নিতেচেয়েছে। তামস ছবিতে এই গণ্ডিবদ্ধতা ভেঙে আরো জটিল বিশ্লেষণেরচেষ্টা দেখা গেছে। এই গন্ডিবদ্ধতা ভেঙ্গে আরো জটিল বিশ্লেষণেরচেষ্টা দেখা গেছে। এই ভাবনারই ধারাবাহিকতা দেখা গেছে দ্রোহকাল ছবিতেঅনেক বড় পটভূমি এবং গভীরতর বিশ্লেষণের ব্যবহারে। ঘটনা, ঘটনার বিস্তার, চরিত্র সব মিলিয়ে 'তামস'-এর মত বড় মাপের ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রে আর দেখা যায়নি। ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের অত্যন্ত পরিণত বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে এই ছবিতে। ক্যামেরার কাজের গভীরতা, দুর্দান্ত দলগত অভিনয়, সুবিন্যস্ত সেট, ছবি জুড়ে অনাগত কিন্তু আসন্ন ধ্বংসের টান টান আশংকা, সব মিলিয়ে 'তামস' ছবিটি যাবতীয় সিনেমার ইতিহাসে এক নতুন পথের কিশোরী হয়ে আছে।

পশ্চিম বঙ্গযদিও বামফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতার মান ভারতের অন্য যে কোন রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি এবং এরাজ্য সমান তালে কেরালার সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছে, তথাপি রাজনৈতিক সিনেমার ক্ষেত্রে এ রাজ্যের অবদান ফুরিয়ে এসেছে। প্রখ্যাত সমালোচক বিবেকানন্দ রায় ষাটের দশকে মৃণালসেনের তৈরি রাগী মার্কসীয় সিনেমা সম্পর্কে অত্যন্ত পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মার্কসীয় সরকার সেসব ছবি প্রযোজনা করেছে বলেই যে শ্রী রায় সে সব ছবিকে মার্কসীয় সিনেমা বলেছেন তা নয়। এ সবছবির নির্মাতারা সকলেই আদর্শগত ভাবে দীক্ষিত মার্কসিস্ট। ১৯৭১ সালে''ইন্টারভিউ'' থেকে শুরু করে মৃণাল সেনের বহু ছবিতে মার্কসীয় লক্ষ্য এবং সামাজিক উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ এমন এক পৃথক ধারা তৈরি করেছে যা পরিচালককে এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি লালিত্য এবং গীতিময়তা বর্জন করে বড় বেশি তির্যক ও কৌশলী পথ অবলম্বন করেছেন, যার ফলে তার শেষের দিকের বহু ছবিতেই বিশুদ্ধ শিল্পীসত্তা অনুপস্থিত এবং সেখানে ভন্ডামি ও কপটতার আভাস।

ষাটের দশকের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সংলগ্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বৈপ্লবিক আন্দোলন দেখা গেছে যার শুরু দার্জিলিং জেলার নক্সালবাড়ী থেকে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দলছুট একদল কমিউনিস্ট চিনের মাও সেতুং-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেয়। তাদের সঙ্গে ছিল এক ঝাঁক উজ্জ্বল প্রতিভাবান যুবক। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কৃষক এবং শ্রমিকদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করা। এই গোষ্ঠির পরিচয়ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট) হিসাবে যদিও লেনিনের থেকেও মাও-এর প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল অনেক বেশী। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বহু কৃতী ছাত্র তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং লেখাপড়া শিকেয় তুলে গোপনে জঙ্গলে জঙ্গলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের তালিম নিয়েছে, শোষণের বিরুদ্ধে উপজাতীয় কৃষক শ্রেণীকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের এই অস্থির এবং রক্ত ক্ষয়ী অধ্যায় বাংলার সাহিত্য, শিল্প এবং সিনেমাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে পরবর্তী বেশ কয়েক বছর ধরে। বেশ কিছু রাগী এবং তরুণ চিত্রনির্মাতা তাদের সিনেমা জীবন শুরু করেছে এই তীব্র রাজনৈতিক বক্তব্যকে পাথেয় করে। তাদের অনেকেই এই সব ছবি বিদেশী চলচ্চিত্র উৎসবে পাচার করতে গিয়ে চোরা বালিতে পথ হারিয়েছে, তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সিনেমায় তাদের অবদান এতে লঘু হয় না,বা কিছু মাত্র কমে যায় না।

উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর''চোখ'', বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের''গৃহযুদ্ধ'' এবং গৌতম ঘোষের ''দখল''এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর চোখ ছবিতে উঠে এসেছে এক উদ্ভট গল্প। নোংরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ফাঁসিতে ঝুলেছে এক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। মৃত্যুর আগে সে তার চোখ দুটি দান করে গেছে।সেই চোখের দখল নিয়ে এক শ্রমিক এবং এক শক্তি শালী রাজনৈতিক মস্তানেরমধ্যে সংঘাত। এই ছবিতে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরো অজস্র প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। মৃত শ্রমিকের চোখ দুটি তারছেলের জন্য একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু শিল্পপতি মালিক তা কিছুতেই হতে দেবেনা। শিল্পপতির ধারণা একজন মার্কসীয় শ্রমিক নেতারচোখ মার্কসীয় বিপ্লবের প্রতীক। তা হলে কি ধরে নিতে হবে যে, মার্কসবাদী শ্রমিকটির মৃত্যুর সাথে সাথে বিপ্লবেরও মৃত্যু ঘটবে?

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ‘‘গৃহযুদ্ধ’’ছবিটির বুনট অনুসন্ধানী সাংবাদিককে নিয়ে, যে এক কারখানা মালিকের ক্রমাগত ধারাবাহিক অপরাধকে খুঁজে বার করতে চাইছে। মালিক এই সংবাদকে গোপন রাখতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত তারই পরিণতিতে সংবাদিকের মৃত্যু।

গৌতমঘোষের ‘‘দখল’’ ছবি এক জমিদারের বিরুদ্ধে এক বেদে সম্প্রদায়ের তরুণী বিধবার তীব্র প্রতিরোধের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। প্রথম বার সেই মহিলা ব্যস্তচ্যুত হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা থেকে। দ্বিতীয়বার স্থানীয় জমিদার সেই মহিলাকে আবার ভিটে ছাড়া করতে চাই ছিল। ১৯৮৪ সালে ‘দখল’ সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছিল। ছবির প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু ছবিটি মুক্তি পাওয়ার সময় বিস্তর প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছিল মূলত প্রশাসনের অপদার্থতা এবং পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র আইন সম্পর্কে আমলাতন্ত্রে অজ্ঞতার কারণে।গৌতম ঘোষের তেলেগু ছবি ‘‘মা ভূমি’’র পটভূমি তেলেঙ্গানার অভ্যুত্থান। বহু চরিত্র এসেছে এই ছবিতে, প্রায় সকলেই প্রকৃত কৃষক। একজন সদ্য চিত্র নির্মাতার পক্ষে ‘‘মাভূমি’’ প্রকৃত অর্থেই এক দুরূহ কাজ।

যখন গৌতম ঘোষের ‘‘পার’’উদ্বোধনী ছবি হিসাবে ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হলো, এবং ভারতবর্ষেও এই নিয়ে বিস্তর হৈ চৈ হলো, গৌতম ঘোষ কিন্তু তখন চলচ্চিত্র উৎসবের লক্ষ্যে ছবি করার বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। তার মতে চলচ্চিত্র উৎসবগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর ঔৎসুক্য দেখাচ্ছে। কিছুকিছু ছবি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই রাজনৈতিক, কিছু ছবি মূল্য দিচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের প্রতি, আবার কোন ছবির মধ্যে বক্তব্যের গভীরতাই নেই। এরকম একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থায় চলচ্চিত্র উৎসবের লক্ষ্যে ছবিকরা যায় ? কিন্তু পরবর্তীকালে ‘‘অন্তর্জলি যাত্রা’’ থেকে শুরু করে ‘‘পতঙ্গ’’ পর্যন্ত সব ছবিই কিন্তু জনসাধারণের সামনে এসেছে কোন না কোন চলচ্চিত্র উৎসবের দরজা পেরিয়ে, তা স্বদেশেই হোক অথবা বিদেশে।

এই সব তরুণ এবং রাগী চিত্র নির্মাতাদের কাজইতাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের কথা বলে দেয়। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত যখন‘‘দুরত্ব’’ ছবি তৈরি করেন, তখন তিনি ছিলেন অর্থনীতির শিক্ষক এবং প্রচুর কবিতা লিখছেন। ‘‘মুক্তি চাই’’ ছবি করার সময় উৎপলেন্দু চক্রবর্তী একজন আত্মগোপনকারী উগ্রপন্থী। এদের ছবির সব থেকে লক্ষ করার বিষয় হলো নান্দনিকচেতনা এবং তীব্র রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার সুচা সমন্বয়। এই সব ছবিগুলি রাজনৈতিক প্রচারের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলির যেমন নান্দনিকসৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং পরিচালকেরা বিশিষ্টস্থান করে নিয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে, তেমনই নতুন ভাবনা, নতুন সঙ্গীতের প্রয়োগ, অভিনব ক্যামেরার কাজ, এমনকি অভিনয়ে পর্যন্ত এই সব সিনেমায় এক নতুন শিল্প প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে। সিনেমার প্রতিটি পদক্ষেপে এরা নতুন প্রতিভার উন্মোচন ঘটাতে পেরেছেন। সিনেমার মূল উৎস হিসাবে কেউ বেছে নিয়েছেন সাহিত্যকে,কেউ সংবাদপত্রের রির্পোট, কেউ বা প্রামাণ্য গবেষণা থেকে তাদের সিনেমার উপাদান খুঁজে নিয়েছেন। মৃণাল সেনের‘‘পরশুরাম’’ ছবির ভিত্তি হলো বস্তির মানুষের জীবনধারণ সম্পর্কিত গবেষণা। ‘‘চোখ’’ গল্পের উৎস এক সংবাদপত্রের রির্পোট। আরোহণ কাহিনীর সূত্র পাওয়া গেছে সরকারী দলিল থেকে।কিন্তু এই সব চিত্র নির্মাতাদের প্রথম আত্মপ্রকাশের সময় তাদের মধ্যেযে ভাবনার বিচ্ছুরণ দেখা গিয়েছিল, তাদের পরবর্তী ছবিতে সে সব ভাবনা ভ্রান্ত

প্রমাণিত হয়েছে। সিনেমা তৈরির ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজের নিজের পথ বেছে নিয়েছেন। এই তিন চিত্রনির্ম্মাতার কেউই কিন্তুপরবর্তীকালে ছবিতে রাজনৈতিক বক্তব্য আনেননি। কেন?

সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে কলকাতার অস্থিরতা সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেন উভয়কেই উৎসুক করে তুলেছিল এবং দুজনেই কোনরকম সাধারণ যোগসূত্র ছাড়াই ত্রয়ী বা ট্রিলজির ধাঁচে তিনখানি করে ছবি করেন। সত্যজিৎ রায় ''প্রতিদ্বন্দ্বী''ছবি করলেন ১৯৭০ সালে। ১৯৭১-এ ''সীমাবদ্ধ'' এবং''জন অরণ্য'' করলেন ১৯৭৫ সালে।''প্রতিদ্বন্দ্বী'' ছবিতে সত্যজিৎ রায় দেখিয়েছেন সমগ্র সামাজিক রাজনৈতিক পরিকাঠামো ছবির প্রতিবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে। সেলড়াই-এর মধ্য দিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চাইছে কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে।''জন অরণ্য'' ছবিতে বিশাল কলকাতা শহর বঞ্চিত মানুষের সংহতি এবং আত্মসম্মান বোধের শেষ চিহ্ন টুকু পর্যন্ত মুছে দিতে চাইছে। এমন কি তাঁর কল্পকাহিনী ''গুপী গাইন বাঘাবাইন'' এবং ''হীরক রাজার দেশে'' ছবিতে গান এবং দৃশ্যমান রূপকের চমৎকার প্রয়োগে সত্যজিৎবাবু যুদ্ধ এবং যুদ্ধের অসারতা, নিঃশব্দ সংহতি এবং রাজনৈতিক অবদমনের বিরূদ্ধে বিদ্রোহকে তুলে ধরেছেন। সত্যজিৎ রায় দ্ব্যর্থবোধক ব্যঞ্জনায় ছবির কাঠামোকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যাতে শিশুরা তাদের কল্পনায় এ সব ছবিকে উপভোগ করতে পারে মজাদার অভিযান হিসাবে। আবার বয়স্কদের পরিণত ব্যাখ্যায় সে সবই ছবি চূড়ান্ত রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে এক তীব্র শ্লেষাত্মক ছবি। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় দুই সাদাসিধে গ্রাম্য যুবকের মজাদার কাহিনীর ছদ্মবেশে তার নিজের যুদ্ধ বিরোধী এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী বক্তব্য শুনিয়ে গেছেন।

যদিও সত্যজিৎ বাবুর ''ঘরে বাইরে'' ছবি রবীন্দ্রনাথের ক্লাসিক উপন্যাসের ভিত্তিতে তৈরি, তথাপি ভন্ড বিপ্লবীর ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি সেখানে নিজস্ব বিদ্রুপেরছোঁয়া লাগিয়েছেন। সুকৌশলে তিনি ঐ ভন্ডামির পাশাপাশি একদল দরিদ্র প্রজার প্রতি এক নীরব জমিদারের আত্মিক দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেছেন। সোচ্চার রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে না গিয়ে সত্যজিৎ বাবু সূক্ষ্মরূপকের ব্যবহার সত্ত্বেও দর্শকের মনে, অনেক সোচ্চার চিত্র পরিচালকের থেকেবেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

একই বিষয়কে মৃণাল সেন দেখেছেন অন্য দৃষ্টিতে। তার কলকাতা ভিত্তিক ট্রিলজির প্রথম ছবি ইন্টারভিউ-এ তিনি স্পষ্টই রাজনৈতিক প্রবক্তা। এক উজ্জ্বল প্রতিভাবান যুবক চাকরি পাচ্ছে না, কারণ একপ্রস্থ স্যুটের অভাবে সে কিছুতেই ইন্টারভিউ গ্রহণকারীদের প্রভাবিত করতে পারছে না। হতাশ যুবকটি রাস্তায়বেরিয়ে এক পোশাকের দোকানের কাচ ভেঙে শো-কেসে বসানো মুর্তির গা থেকে পোশাক খুলে নিচ্ছে।

মৃণাল সেন এখানে ব্রিটিশ উপনিবেশিকতার ধারাকেই রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ''কলকাতা ৭১'' ছবিতে শ্রীসেন গল্প বলার প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়েএসেছেন। সাধারণ কাহিনী বর্জন করে তিনি প্রচার পুস্তিকার আঙ্গিকে গল্পকে বেঁধেছেন। তিনি তিনটি পৃথক ঘটনাকে বেছে নিয়েছেন ১৯৭১ -এর কলকাতার অস্থিরতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে। প্রথম ক্ষেত্রে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের গল্প

(১৯৩৩) নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কলকাতার বস্তিতে অঝোর বৃষ্টির রাতে জানোয়ার এবং মানুষের সহাবস্থান। দ্বিতীয়গল্পের পটভূমি ১৯৪৩ সাল। পরিবর্তিত সমাজের প্রেক্ষাপটে একনিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মূল্যবোধের সংকট নিয়ে কাহিনীর বিস্তার। তৃতীয় ছবিটি তৈরী হয়েছে ১৯৫৩ সালে। এই ছবির কাহিনী কিশোর বয়সী একদলছেলেকে নিয়ে, যারা ঘরের চুলো জ্বালাবার তাগিদে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে চাল পাচার করে। তিন দশকের পটভূমিতে এই তিনটি ছবি, যাদের মূল সুরটি একই- শোষণ এবং বঞ্চনা, সেটাই হলো কলকাতা ৭১ ছবির প্রেরণা। সে সময় লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী আতঙ্কবাদের অভিঘাতে সারা কলকাতা শহর জ্বলছে। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে কলকাতার বুকে এই আতঙ্কের ছবি আঁকতে গিয়ে মৃণাল সেন স্থান কালের গণ্ডিকে হেলায় ভেঙেছেন। কিন্তু চুড়ান্ত বিশ্লেষণে তার এই গদারধর্মী প্রচেষ্টা খুব একটা কার্যকরী হয়নি। কারণ সমকালীন সময়ের কলকাতার রাজনৈতিক বাতাবরণ দৃষ্টিতে কিছু আতিশয্য দেখাগেছে।

১৯৭৩ সালে তৈরি''পদাতিক''-এর কাহিনী এক রাজনৈতিক উগ্রপন্থীকে নিয়ে যে, পুলিশ থানা থেকে পালিয়ে এক মহিলার কাছে আশ্রয় নিয়েছে, যিনি কোন রাজনীতির অনুগামী নন। এই প্রতিবাদী চরিত্রের মাধ্যমে শ্রীসেন কমিউনিস্ট পার্টির নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন,নেতৃত্বের মধ্যেও দুর্বলতা আবিষ্কার করেছেন। এই ছবিতে শ্রী সেনের রাজনৈতিকমন্তব্য সরাসরিভাবে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এই ছবিতে যা সাধারণ দর্শকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তা হলো অতি সূক্ষ্মতার সঙ্গে পিতাপুত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন। ছবির ক্লাইম্যাক্সে দেখা যাচ্ছে পিতা বলছেন তিনি এমন কোন দলিলে সই করেননি যাতার উগ্রপন্থী পুত্রের আদর্শ এবং স্বপ্নকে ভেঙে দিতে পারে। শ্রীসেনের সদিচ্ছা অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে বোম্বাই-এর ম্যাগাজিনের পাতা থেকে উঠে আসা চটকদার চিত্রাভিনেত্রী সিমিকে ব্যবহারের কারণে, যিনি ছবিতে ফেরারী ছেলেটির আশ্রয়দাত্রী।

১৯৭৪ সালে নির্মিত 'কোরাস' ছবিতে শ্রী সেননতুন স্টাইল এবং উপহাসধর্মীতার পাশাপাশি নব্যবাস্তবতা এবং প্রামাণ্য ঘটনাচক্রকে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করেছেন।এখানে তিনি সরাসরি দর্শকদের সম্বোধন করেছেন। কাহিনীর মূল বিষয় ছিল বেকারীত্ব, কিন্তু তার এই পরীক্ষা দারুণ ভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এই নতুন স্টাইল বা পদ্ধতি শ্রী সেন যথাযথভাবে আত্মস্থ করতে পারেননি। ফলে ছবি যত এগিয়েছে শ্রী সেনের অস্বাচ্ছন্দ্য তত প্রকট হয়েছে। ১৯৭৬ সালেতৈরি 'মৃগয়া' ছবির মধ্যে ১৯০১ সালে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে সংঘটিত সাওঁতাল বিদ্রোহের এক ঝলক দেখা যায। এখানে তিনি সেই পুরানো অত্যাচার এবং বিদ্রোহের কাহিনীতে ফিরে এসেছেন। তার 'পরশুরাম' ছবিতে সমাজ-বাস্তবতা এবং গ্রামীণ কথকতা ও প্রমোদ মাধ্যমের এক সুচা সমন্বয়। এই ছবির গল্প এক ভ্রাম্যমাণ গ্রাম্য ব্যাক্তিকে নিয়ে যে, কলকাতার বস্তির মানুষ জনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কাঁধে কুঠার নিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে তার জেহাদ কাহিনীকে নিয়ে গেছে কল্পগল্পের স্তরে। শ্রীসেন এই চরিত্রটিকে তুলনা করেছেন মহাভারতের দলিত সম্প্রদায় থেকেউঠে আসা পরশুরামের সঙ্গে। মহাভারতের পরশুরাম উচ্চবর্ণীয় যোদ্ধা শ্রেণীর বিরূদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিজের পিতাকে হাতের কুঠার দিয়ে একুশ বার আঘাত করেছিলেন। কিন্তু সেই পরসু রামের আধুনিক সংস্করণ হিসাবে চরিত্রটি তেমন মাত্রা পায়নি, বড় বেশি কৃত্রিম মনে হয়েছে।

কলকাতার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এক নারীর সাংসারিক শোষণ এবং নারীর সার্বিক স্বাধীনতা হীনতার রাজনীতিকে তুলে ধরাহয়েছে মৃণাল সেনের ‘‘একদিন প্রতিদিন’’ ছবিতে। ১৯৭৯সালে ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। রাজনৈতিক বক্তব্যকে মিহিবুনটের ওড়নার আবরণে শৈল্পিক কুশলতায় পরিবেশন করেছেন শ্রীসেন। বিবেকানন্দ রায় এই ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ‘‘এই ছবি তথাকথিত পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর সংস্কার, ভীতি, সংশয় এবং বিধবস্ত অর্থনীতির পটভূমিতে এই সমাজ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির এক নির্দয় বিশ্লেষণ। ছবিটিতেব্যবহৃত সাউন্ডট্রাকে তার যন্ত্র এবং পারকাশন যন্ত্রের আবহ সংগীত ছবির রাজনৈতিক মূল সুরটিকে উচ্চকিত করে তুলেছে।

১৯৮২ সালে তৈরি ‘খারিজ’ ছবিতে দেখানোহয়েছে শহর কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবক্ষয়ী মানবিক মূল্যবোধ। গল্পে দেখানো হয়েছে বাইরের মানুষের প্রতি এক দম্পতির সংকীর্ণ চিন্ততার ফলে তাদের বাচ্চা চাকর ছেলেটিকে মরতে হয়েছে কার্বন মনোক্সাইডের বিষবাষ্পে। শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা আটকাবার জন্য সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে ছেলেটিকে রান্না ঘরে শুতে হতো। উনুনের ধোঁয়া আর তাপে ছেলেটি মারা যায়। মৃত ছেলেটির বাবা এলে সেই দম্পতি ঝামেলা এবং বদনামের ভয়ে আতংকিত। কিন্তু তাদের সে আশংকা মিথ্যা প্রমাণিত হবার সাথে সাথে তারা আবার মধ্যবিত্ত জীবনের আরাম এবং সন্তুষ্টির বৃত্তে ঢুকে পড়ে। শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা ছাড়াও খারিজ ছবিটি শোষিত দরিদ্র শ্রেণীর অসহায়তার এক মর্মস্পশী চিত্র তুলে ধরেছে। এমনই তাদের অসহায়তা যে মৃত ছেলেটির পিতা তার পুত্রের মৃত্যুকে পর্যন্ত তার বঞ্চিত জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ বলেই মনে করে।

‘‘খন্ডহর’’ ছবির বিষয়বস্তু হলো বুর্জোয়া শ্রেণীচেতনা এবং নারীকেঘরবন্দী করে রাখার সামন্ততান্ত্রিক অভ্যাসের বিরুদ্ধে এক পুঞ্জীভুত নিঃশব্দক্রোধ। এই ছবিতে আরো দেখা গেছে এক সৃজনশীল শিল্পী, শহর থেকে আসা এক ফটোগ্রাফারকে, যে অত্যন্ত কৌশলের দাথে এই যাতনাময় মানবিক অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করছে ব্যবসায়িক এবং নান্দনিক প্রয়োজনে। অতীতের ধবংস স্তূপের মধ্যে একটি মেয়ের ছবি তুলছে সেই ফটোগ্রাফার এবং শেষ পর্যন্ত সেই ছবি তার স্টুডিওতে স্থানপেয়েছে শহুরে কেতাদুরস্থ মডেলদের পাশাপাশি। সব মিলিয়ে এক সোচ্চার রাজনৈতিক বক্তব্য, বিবিধ শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যবহার, অপব্যবহার অথবা বিকৃত ব্যবহার দেখা গেছে এই ছবিতে যেখানে আপাত অর্থে শক্তির আদৌ কোন অস্তিত্ব থাকারই কথা নয়।

১৯৮০ সালে ‘‘আকালের সন্ধানে’’আদি অনন্ত কাল জুড়ে বিশ্বজনীন ক্ষুধার চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পের মাধ্যমে। সমকালীন সময়ে এই বিষয়ের উপরেই তৈরি হচ্ছে বাংলার বিখ্যাত দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৩ সালে বাংলার কালান্তক দুর্ভিক্ষকে ভিত্তি করে এক ফিল্ম কোম্পানীর শুট্যিং করার জন্য হাজির হয়েছে একদা সামন্ততান্ত্রিক এক প্রত্যন্ত গ্রামে। কিন্তু গ্রামের মানুষ, যারাএকটু একটু করে পরিচিত হচ্ছে ছবির চরিত্রদের সঙ্গে, তারা এক সময়েক্ষীপ্ত হয়ে উঠছে ফিল্ম কোম্পানীর উপর তাদের অভিযোগ, ফিল্ম ওয়ালাদের কারণে গ্রামে জিনিষ পত্রের প্রচন্ডভাবে বেড়েযাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেই ফিল্মকোম্পানী ছবির কাজ বন্ধ করে শহরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। অতি সহজিয়া ভঙ্গিতে ফিল্ম কোম্পানীর রূপকে পরিচালক চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন কৃত্রিম ক্ষুধা কিভাবে সৃষ্টিহয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, সমান্তরাল চিত্র নির্মাতারা ফিল্ম মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূলস্রোতে চিত্র নির্মাতাদের তুলনায় অনেকবেশী বৌদ্ধিক। কিন্তু বিগত দিনের ইতিহাসের দিকে তাকালেদেখাযাবে যে, সমান্তরাল সিনেমার সাথে মূলস্রোতের সিনেমার অমিল শুধু ভাসাভাসা, গভীরতাবিহীন। অল্পব্যয়, নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী , লোকেশন কেন্দ্রিক শুটিং, ছোট অঙ্কের উৎপাদন ব্যয়, যত্রতত্র নাচ গানের ব্যবহার বর্জন, মিতব্যয়ীসেট - মূলত এ সব ক্ষেত্রেই সমান্তরাল সিনেমার চরিত্র মূল স্রোতের সিনেমার থেকে পৃথক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারত বর্ষে এমনসিনেমার সংখ্যা একান্তই নগণ্য, যা ভারতবর্ষে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনকে সরাসরি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে পেরেছে।

তৃতীয় সিনেমার সম্ভাবনার কথা একমাত্র তখনই ভাবাযেতে পারে, যখন ভারত বর্ষে সামাজিক সংগঠন এবং সমাজ কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটবে। তৃতীয় সিনেমাকে এই মাধ্যমটির রীতি নীতি বুঝতে হবে গভীর ভাবে। চিত্র নির্মাতার চারপাশের পরিমন্ডল সমকালের পটভূমি এবং সামাজিক কাঠামোকে উপলব্ধি করতে হবে। প্রচলিত ধারাকে বিশ্বস্ত ভাবে অনুধাবন করাই হচ্ছে ইতি বাচক কাজ এবং গঠন মূলক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়েতাকে ভাঙার এবং পরিবর্তন করার একমাত্র আবশ্যিক শর্ত।

অবশেষে আনন্দ পট্টবর্দ্ধনের কথা দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। তিনি বলেছেন ‘‘গণতান্ত্রিক ছবির অনুসন্ধান জারী রাখতে হবে, এটা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়, যে এর সাথে বৈপ্লবিক মাত্রা যোগ করলেই বার্তা প্রেরণের জন্য প্রচলিত ধারা থেকে মুক্তির পথ পাওয়া যাবে। একাধিক দিক থেকে এইধারা তৈরির কাজটি রাষ্ট্রের বিলোপ হয়েছে এমন একটি সত্যিকারের শ্রেণীহীন সমাজ গড়েতোলার কাজের মতন গুরু ত্বপূর্ণ।’’

ফ্রী-ল্যান্স সাংবাদিক এবং লেখিকা সোমা এ. চ্যাটার্জি দু’দশকেরও বেশী সময় ধরে লিখে চলেছেন। চোদ্দটি গ্রন্থ তিনি লখেছেন যার মধ্যে এগারটি প্রকাশিত হয়েছে এবং বাকি তিনটি প্রকাশের অপেক্ষায়। এর মধ্যে চারটি নারীবাদ, দুটি নারীবাদী চলচ্চিত্র, চারটি ছোট গল্পের সংগ্রহ এবং চারটি চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের জীবনী সম্পর্কিত। এশিয়া এবং ইউরোপের বহু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'FIPRESCI Jury’ র সদস্য ছিলেন। ১৯৯১-এ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৯৮-এ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সমালোচক বি. এফ. জে. পুরস্কার এবং সম্প্রতি ২০০৩-এ তাঁর লেখা 'Parama and Other Outsiders - The Cinema of Aparna Sen' চলচ্চিত্র গ্রন্থের জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। মূলতঃ ইংরাজীতেই তিনি লিখে থাকেন। The Statesman, The Economic Times, The Hindsthan Times, New time, Screen প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে থাকেন। বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা। রাজনৈতিক সিনেমা আসলে কি? বাংলা তথা ভারতে রাজনৈতিক সিনেমার নির্মাণের ধারা কি? বিভিন্ন প্রথিত যশা চলচ্চিত্র কারেরা কিভাবে কোন রাজনৈতিক বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন তাঁদের সৃষ্টিকে - তারই এক বিশ্লেষণ রয়েছে এই রচনাটিতে।